ভারত সঙ্গীত

[অধ্যাপক—শ্রীকৈলাস চন্দ্র সরকার]

ঋষি-প্রদত্ত সঙ্গীত-শাস্ত্র ভারতের একটী গৌরবের সামগ্রী। ভারত সঙ্গীতই ভাল, কি ইউরোপের সঙ্গীতই ভাল ইহা লইয়া মতভেদ আছে। তৈয়ারী কাণ যাঁহার সেই কেবল সঙ্গীতের মধুরতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে। নতুবা কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ইহা লইয়া আন্দোলন করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি ভারতের লোক সুতরাং আমার কাছে ভারতের সবই ভাল। অন্য দেশের কিছুই তেমন ভাল নয় এ ধারণাটা ভ্রান্তি মূলক। উচ্চাঙ্গের ঐক্যতান বাদ্য হইতেছে শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীত বিশারদেরা সুকৌশলে অধীত ও সাধিত বিদ্যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন! সে সঙ্গীত সে কৌশল বিদেশী! শ্রোতাদিগের মধ্যে কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি এদেশী! তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "এ তো বাজনা না, ছেলে খেলা।" কানে ভাল লাগিল না, উপায় কি?

যৌবনের প্রারম্ভে সমবয়সী কয়েক জন বন্ধু গির্জ্জায় উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছি। কর্ত্তারা কত যত্নে কত আদরে আমাদিগকে তাঁহাদিগের নিকটে বসিতে আসন দিয়াছেন। স্তব গান হইতেছে। পুরুষের মোটা আওয়াজ ও মেয়ের মিহি গলা, দুইটীতে মিশিয়া মোলায়েম মনোহর 'সোনালী রূপালী' রকমের ভাবের প্রভাব বহাইতেছে। তারা গ্রামের অতি উচ্চে সুর উঠিয়াছে। তখন পুরুষেরা প্রথম এবং মেয়েরা পরেই উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। হঠাৎ আমার এক বন্ধু, তার স্বরটী মেয়েলী রকমের খুবই সরু। মহিলাগণের সেই উচ্চস্বরে উচ্চৈঃস্বরে হাসির হররা মিলাইয়া দিল!

আবার বিদেশীরা সাধারণতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে অপরাগ। তাহারা বলে ভারতের সঙ্গীতের গীত ও বাদ্য উহাদের কাণে মিষ্ট লাগে না। তাহার প্রধান কারণ এই সুরের উঠা নামা, গতির পরিবর্ত্তন, তালের কারচুপী, এই সকল উহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। তাই এদেশীরা যেমন উহাদিগের গান বাজনা শুনিয়া হাসে, উহারা তেমনি আমাদিগের গীত বাদ্য উপেক্ষা করে।

ইউরোপীয়েরা সঙ্গীতে অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। তার প্রধান কারণ, ঐ সকল দেশের বিজ্ঞান-বিদেরা সঙ্গীত সাধনা করে। সুর একটী উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের মত কি উহার অনুশীলন হইয়া থাকে? এখন ক্রমে ক্রমে সঙ্গীত শিক্ষিত সমাজের স্তরে শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু এখন সঙ্গীত পিতৃমাতৃ হীন। কারণ দেশময় ওস্তাদের দল। তাহারা প্রত্যেককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী ভারতের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা সেই সেই ভারতে সর্ব্বপ্রধান ধনুর্দ্ধর। তাহাদের মতে অন্যান্য গণ্ডীর মধ্যে যাহারা তাহারা কিছুই নয়। পরস্পরের সুখ্যাতি দূরে থাকুক অখ্যাতি প্রচার করাই তাঁহাদের কাজ। সঙ্গীত উৎসবে বিরুদ্ধ দলের সমাগম হইলে অনেক সময়েই সঙ্ঘর্ষ, এমন কি মারামারি—"আঁচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি, ধরাধরি করি সবে যায় গড়াগড়ি।" যদি জিজ্ঞাসা করা যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক কে? জোড়াসাঁকোর দল বলিবে তাহাদের নেতার নাম, বহুবাজারের গণ্ডীর লোক বলিবে তাহাদের ওস্তাদের কথা, হাটখোলার লোক বলিবে হাটখোলার গায়কের নাম। ঐরূপ জেলায়, জেলায়, গ্রামে গ্রামে। যেমন গীতে তেমনি বাদ্যে। ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া উহারা নিজে নিজে

তাহার চুল চের ভাগ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু এমন একটা বিদ্যার এরূপ ভাগবাটোয়ারা কি যেমন তেমন আক্ষেপের কথা ?

সঙ্গীতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ সরকারী শিক্ষা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি ক্রমে নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে সঙ্গীতের এ দুর্দ্দশা দূর হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। সঙ্গীত কয়েকটী প্রদেশে সরকারী শিক্ষা বিভাগে গৃহীত হইয়াছে। এ প্রদেশে হয় না কেন? বাঙ্গালী কি সঙ্গীতেও কাঙ্গালী হইয়া থাকিবে ?

এদেশী সঙ্গীত প্রণালী অতি উচ্চ। অনেকের বিশ্বাস, স্বরে ইউরোপের সঙ্গীতই উচ্চতর। একথা কিছুতেই ঠিক নয়। ইউ-রোপীয় সঙ্গীতে দুই সুরের মধ্যে কেবল কড়ি ও কোমল ভেদ। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ভেদ অধিকতর সূক্ষ্ম। শ্রুতি তাহার এমন ব্যাপার যে বিদেশীরা উহা বুঝিতেই পারে না। এদেশী সঙ্গীতের আর একটী বিশেষত্ব আছে। সে বড় অসাধারণ বিশেষত্ব। সেটি তাল। তাল কি উহাদেরও নাই ? আছে। কিন্তু দু'য়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ। উহাদের তাল আদম ও ইভের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই একঘেয়ে এক একটী মাত্রা ব্যাপিয়া এক এক ঘা। সে তালে এ দেশের রাজমিস্ত্রী মজুরেরা, মেয়ে পুরুষ বালক বালিকা সবাই সমান দক্ষ। মেজে কি ছাদ পেটার সময় সে তাল বোধের পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের তাল পৃথক একটী বিদ্যা। কত ছন্দ ! মূল তালগুলি ত আছেই, তা ছাড়া আবার অলঙ্কার। সেগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি সংখ্যাতীত। মাত্রা লইয়া কত কেরামতী। আট মাত্রার তালে ষোল বত্রিশ এমন কি চৌষট্টি মাত্রার অলঙ্কার প্রয়োগ। বিদেশী ওস্তাদকে ইহার রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া না দিলে বুঝিবার ক্ষমতা কোথায় ? কিন্তু বিধিবদ্ধ

শিক্ষাদান ও অনুশীলন করা বিদ্যার যথারীতি ব্যবহারের সামর্থ্যের অভাবে বাস্তু বিদ্যার উদ্দেশ্য অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমি খুব ওস্তাদ, আমি খুব জানি, আমার ইচ্ছামত বাজাইব। গান নষ্ট হইয়া যায় যাউক। সেতার, এসরাজ, বেহালা, বাজনা বিসর্জ্জন দেওয়া হউক, ডুবিয়া যাউক, তাহা দিয়া আমার দরকার কি? আমার ওস্তাদী আমার কাছে। ইহা ছাড়া আর কি কিছু আমি মানি? এই ভাবের জন্যই অনেকের নিকটে তবলা পাখোয়াজের বাদ্য হেয় হইয়া পড়িয়াছে। আবার গায়কের কৃতিত্বেও ভারতীয় সঙ্গীত অনেক সময় অশ্রাব্য হইয়া উঠে। বিদ্যাদিগ্‌দজের গানে শৈলেশ্বরের ষাঁড় বিকট শব্দ করিয়া, লেজ তুলিয়া পলাইয়াছিল, এ কথা বঙ্কিমের কপোল-কল্পিত নয়। আমি স্বচক্ষে ওরূপ দেখিয়াছি। ঠিক চার পা ওয়ালা ষাঁড় নয় অন্ততঃ দ্বিপদ নরপুঙ্গবের পলায়ন ব্যাপারের আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী। আমি নিজে প্রায় পালাইয়াছিলাম কিন্তু পারি নাই। পাবনা শহরে যখন আমি শিক্ষকতা করি তখনও সঙ্গীতের বাতিক পুরা পুরিই ছিল। প্রাণটী "ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা।" স্ফূর্ত্তির মূল ফোয়ারা সঙ্গীত ও সাহিত্য। সরস্বতী পূজার দিন বিকালবেলা গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমার আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। দেখি এক অতিকায় পুরুষ যেমন তাহার বিরাট বপু, তেমনি হাতে এক বিশাল তানপুরা। আমি পৌঁছিলে দেখিলাম তখন আর গান নাই। কিছু পূর্ব্বেই একটা গান শেষ হইয়াছে। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম সকলের মুখে বিরক্তির ভাব; গায়কের মুখখানি স্বভাবতঃই ত ভারী। সে ভাবের উপরে আরও যেন প্রকাণ্ড ভার চড়িয়াছে। সভার কর্ত্তা বর্ষীয়ান গোপাল বাবু আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এই ত কৈলাসবাবু এলেন, আপনি বাজান।" এই কথায় কারও কারও

মুখে ঈষৎ হাসির ভাব বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম আরও ৩।৪ জন তবল্‌চী বসিয়া আছে। তাহাদের মুখে অত্যন্ত রাগের ভাব। কি করি তবলা লইয়া বসিলাম। গাইয়ে গান আরম্ভ করিলেন। সে রব যে কিসের রব তাহা বোঝা কঠিন। ষাঁড়ের স্বর কি সিংহের গর্জ্জন কি মেঘের ডাক তাহা মালুম করা মুস্কিল। বাজাইতে আরম্ভ করিলাম। গোড়া হইতেই গাইয়ে যেন নেকনজরে চাহিতে লাগিলেন। গানের তিন চারিবার আবর্ত্তন হইল। বুঝিতে পারিলাম এইবার শেষ আওরদা। শেষ সম বা মোকাম আসিতেছে বুঝিয়া কায়দা করিয়া তেহাই ধরিলাম। তেহাই শেষ হইতে যাইতেছে, মোকাম পৌঁছিতেছে এমন সময় বিকট স্বরে ওস্তাদ বলিয়া উঠিলেন, "মার বেটার মাথায় লাঠি।" আমি ত লাফাইয়া উঠিলাম। উঠিয়া অনেক দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। যতদুর পর্য্যন্ত লাঠি না পৌঁছে ততদূরে গিয়া নিরাপদ মনে করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। বুক দুড় দুড় করিতেছে। এদিকে দেখি সভাশুদ্ধ সবাই হাসে। ওস্তাদের বিকট মুখেও প্রকট হাসি। তখন ভাবিলাম ভয় নাই। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। তখন হাসির জোর আরও বেশী হইয়া উঠিল। ওস্তাদ বল্‌লেন, "ও লাঠি কি তোমার মাথায়, সমের মাথায় তুমি ত বেশ বাজিয়েছিলে।" ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। বাজাইতে বসিয়া ওস্তাদের লাঠির ঘায়ে মাথা ভাঙ্গিবে, এ আবার কেমন কথা? তাই সরিয়া পড়িয়াছিলাম। এরূপ দৃশ্য আরও অনেক দেখিয়াছি। মুদ্রাদোষ সঙ্গীতের একটী প্রধান অন্তরায়। সেগুলির সংখ্যা অত্যধিক। কোন কারণ নাই। গাইয়ে কি বাজিয়ে হাসিতেছে। কেউ বা বাঁকা হইয়া বসিয়া আছে। হাত নাড়িতেছে। সে নাড়া নয় ত ভীষণ আলোড়ন। কেউ বা জিভ বাহির করিতেছে। কোন কোন গায়ক বা বাদ্যকরের নাসিকা কুঞ্চিত হইতেছে। কাহারও বা শরীর

"দোল দোলা দোল কালা দোলে"র মত দুলিতেছে। এই সব দেখিয়া লোকে না হাসিয়া পারে না। অথচ গান হইতেছে হয়ত করুণ রসের। সে রস তখন কোথায় থাকে? এইগুলি সঙ্গীত শিক্ষার কালেই ত্যাগ করিতে হয়। নতুবা সঙ্গীত সার্থক হয় না। আমার মনে আছে আমাদের দেশে জমিদারের বাড়ীতে একবার কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। আমরা তখন শিশু। স্থানীয় মাইনর স্কুলে পড়ি। কীর্ত্তনীয়া প্রদেশ বিখ্যাত ব্যক্তি। গান হইতেছে মাথুর। সর্ব্বাগ্রে বসিয়া আছেন বাড়ীর কর্ত্তা, তখন বৃদ্ধ, পরম ভগবদ্ভক্ত। গায়ক বৃন্দা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতেছে। এক হাঁটু পাতিয়া আর এক হাঁটু খাড়া রাখিয়া কর্ত্তার দুই ইঞ্চি ব্যবধানে ডান হাতখানি দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতেছে, "তুমি লম্পট, তুমি শঠ।" কর্ত্তা মাথা হেট করিয়া আছেন। এই মধুর উক্তিগুলি যেন তাঁর প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছে। চারিদিকে নজর করিয়া দেখিলাম আমাদের চাইতে যাহারা বড়, তাহারাও হাসিতেছে। আমাদের ত হাসি ঢাকিয়া রাখা বড়ই দায়। দূতীর বাক্যবাণ আরও জোরে বর্ষিত হইতেছে। সেই কথাগুলি আবার দোহারেরা দ্বিগুণ জোরে বারে বারে আবৃত্তি করিতেছে। আমরা আর সহিতে পারিতেছি না। গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন যুবক। হাসিতে হাসিতে সরিয়া পড়িল। কিন্তু কীর্ত্তনের গান যখন জোরে জোরে আরম্ভ হইল তখন দুই দিকে দুই খোলী যাহা করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আর ধৈর্য্য রহিল না। তাহাদের মাথা মোড়া। সেই নেড়া মাথায় বড় বড় দুই জটাবাঁধা টিকি। ঝড়ে যেমন তেঁতুলের ঝোঁপা জোরে জোরে নড়ে এদের টিকিরও সেই অবস্থা হইল। সারা শরীর ত মৃগী রোগীর মত কাঁপিতেছে বটেই তাহার উপর আবার মুখে "ধেঁই ধেই ঝা ঝা" আরও কত রকমের রব। আমরা আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। সদল

বলে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া দাঁড়াইয়া হাত তালির চোটেই কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিলাম। কিন্তু তারপর দিন আর আমরা ঢুকিতে পারিলাম না। কর্ত্তা দারোয়ানকে বলিয়া দিলেন, "স্কুলের ছেলেদিগকে ঢুকিতে না দেওয়া হয়।" এই সকল মুদ্রাদোষ নিবারণ না হইলে সঙ্গীত-সরস্বতীর যে সুজ্ঞানে গঙ্গালাভ!

আর দুটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। পবনায় যে অক্সফোর্ডের বি, এ পাশ সাহেব ও তার স্ত্রীকে বাঙ্গলা পড়াইতাম তাহারা স্বর্ণলতা পড়িতে পড়িতে যখন পড়িল, "বাজিয়ার কলেরা হওয়ায় গান হইতে পারে না সেইজন্য বিধুভূষণ বাস্তুকরের কাজ চালাইয়া দিল এবং তাহাতে তাহার সুখ্যাতি হইল।" তখন সাহেব বলিয়া উঠিল, "বাজিয়ার কাজ কে না করিতে পারে? আমিও পারি।" আমি বলিলাম, কল্যই তোমাকে বুঝাইয়া দিব যে তুমি পার না।" ঐ সময় কাশী হইতে এক সেতার বাজিয়ে আসিয়াছিল। সে খুব দ্রুত বাজাইতে পারে। সেজন্য তার ভারী গর্ব্ব। স্থানীয় কর্ত্তারা তার বাজনা শোনার ব্যবস্থা করিলেন এবং উহার সহিত তবলা বাজাইবার ভার আমার উপরেই পড়িল। ঐ সভায় আমার অনুরোধ ক্রমে শ্বেতাঙ্গ ছাত্র ছাত্রীকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সেতারীর হাত খুব সাফ—দ্রুত ও বিলক্ষণ। সে যথাসাধ্য দ্রুত বাজাইল। তবলার লড়াই ও এমন হইল যে তাহার আর বড়াই করিবার কিছু রহিল না। সভার শেষে সাহেবকে বলা হইল, "সাহেব বাস্তুকরের কাজ করিতে পার?" না, না, না, এ যে বিজলী।" জনৈক বন্ধু বলিয়া উঠিল, "মিষ্টি কেমন, যেন পাকা ফজলী।" ভারতীয় সঙ্গীতের বাস্তু যে কি তখন সাহেব বুঝিল। তদবধি হিন্দু সঙ্গীতের ভূয়সী প্রশংসা করিত।

বিদেশে হিন্দু-সঙ্গীতের খ্যাতি ক্রমেই ছাইয়া পড়িতেছে,

আরও পড়িবে। সত্য কখনও গুপ্ত থাকে না। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই সহরে একটী ঘটনা ঘটে তাহাই বর্ণনা করিয়া উপসংহার করিতেছি। এসিয়াটিক সোসাইটীর হলে, দেখিলে হক চকিয়ে যেতে হয় এমন এক সভা। কালা ধলা শামলী ধবলী সব রকমের সমজদার সমাগত। সত্যবালার বীনাবাদন হইবে। সভার সম্মুখের দিকে কয়জন জাপানীর আসন পড়িয়াছে, তাহার পরেই ওস্তাদদিগের বসিবার জন্য ফরাস। তারপরে আবার কেদারা। হলটী একেবারে পুরাপুরি ভরা। সর্ব্বোচ্চ আসনে বসা জাপানী ভদ্র লোকটীর চেহারা অন্য রকমের। কুত কুতে চোক দুটী ছাড়া জাপানী ভাব তাহাতে আর কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না। পরে জানা গেল। ইংরেজ ও জাপানীর সাহর্য্যে তাঁহার জন্ম। শরীরটি মাদুস মুদুস। হাড় জির্ জিরে বা কাট খোট্টা পেটা রকমের গঠন নয়। ইংরাজীও যাহা বলেন চমৎকার। ব্যাকরণ বাণী এবং অন্যান্য সর্ব্ব-বিষয়ে বিশুদ্ধ। তাঁর বক্তৃতা হইল প্রথমেই। পরে আরও দুইজনের বক্তৃতা হইল। একজনের নাম ডাক্তার হরাজ অপর জনের নাম ডাক্তার মোটাজ। দুই জনেই সমান বিদ্বান। লম্বা মেঙ্গুড়। দাশরথীর ভাষায় শত যোজন লেজের পাটা, তারই উপযুক্ত মোটা।" তিন জনের বক্তৃতাই ভারতীয় সঙ্গীতের সুখ্যাতি। সত্যবালার নাম তখন জগৎ জোড়া। বাঙ্গালীর মেয়ে। ব্রাহ্মণ কন্যা এক নাইডুকে বিবাহ করেন। মার্কিন মুলুকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। বিদেশীগণকে তাঁহারই সঙ্গীত শুনাইবার জন্য কর্ত্তাদের এই ব্যবস্থা। সত্যবালা বেহাগ রাগিনী আলাপ করিতেছেন। দশ মিনিট সে সুধার লহরী তর তর বেগে ছুটিতেছে। মানুষ যে মর্ত্ত্যে আছে তাহা যেন তাহাদের মনে নাই। হঠাৎ সেই অর্দ্ধ ইংরাজ অর্দ্ধ জাপানী ধপাস করিয়া আসন হইতে মেজেয় পড়িলেন, কি

হইল ? সংসার মনে ভয়। সত্যবালা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাঁহার আলাপ আধ ঘণ্টা কাল চলিল। সমস্তটা সময় মূর্চ্ছিত ব্যক্তিটি গড়াগড়ি গোড়ামুড়ি দিলেন। যেই আলাপ শেষ হইল অমনি তিনি চেয়ারে উঠিয়া বলিলেন, "একটা গৎ হোক", গৎ হইল। আমি তবলা বাজাইলাম। এইখানেই সঙ্গীত শেষ। যিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন তিনি পৃথিবীর সর্ব্ববিধ সঙ্গীত প্রণালীতে অতুলনীয় সিদ্ধ হস্ত। টোকিও সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষ। বলিলেন "ভারতীয় সঙ্গীতই একমাত্র জীবন্ত সঙ্গীত। উহাতে প্রাণ আছে। সে প্রাণ বড়ই সবল। তাই প্রবল বেগে ঐ প্রাণ আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিয়াছিল।" এই কথাগুলির পুনরুক্তি করিলেন। ডাক্তার হরাজ আর মোটাজ। কিন্তু তাঁহাদের যে ইংরেজী তাহা শুনিলে রসিকরাজ অমৃতলাল বলিয়া উঠিতেন, "এ আবার ক্যাডা ? যাহা হউক উহারা তিন জনেই জানাইলেন যে ফিরিয়া যাইবার সময় ভারত হইতে গায়ক ও বাদক লইয়া যাইবেন এবং জাপানে ভারতীয় সঙ্গীতের শিক্ষদানের বন্দোবস্ত করিবেন। ঐ পর্য্যন্তই। তার পরে কি হইল খবর রাখি নাই। কিন্তু যে ভারতীয় সঙ্গীত ভারতবাসীর ভাগ্যে এমন অভাবনীয় সম্পদ, সেই সম্পদ্ যাহাতে তাহার নিজস্ব হয়, যাহাতে সে উহার অনুশীলনে জগতের নিকটে হাস্যাস্পদ না হয়, যাহাতে ঐ সঙ্গীতের যথারীতি শিক্ষা ও আলোচনা হইতে পারে ভারতেই যদি তাহার আয়োজন না থাকে তবে বিদেশে হইলে লাভ কি ?